বর্ষ-২৩, সংখ্যা-১, ইস্যু-৪২, জানুয়ারি-জুন, ২০২০, কোভিড-১৯ বিশেষ সংখ্যা- ১

সূচিপত্র

- ত্রাণ কার্যক্রম
  করোনাকালীন সময়ে আইডিএফএর মানবিক সাহায্য-সহযোগিতা ২-৩
- ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম
  করোনার শুরুতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা: একজন শাখা ব্যবস্থাপকের অভিজ্ঞতা ৪-৬
- প্রবন্ধ
  ১. কোভিড যুদ্ধে আমাদের জয়ী হতেই হবে
  ২. কোভিড পরিস্থিতিতে এনজিও কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্য পর্যালোচনা ৭-৯
- প্রচ্ছদ কাহিনী
  করোনা ভাইরাস থেকে নিজে বাঁচুন, অন্যকেও বাঁচতে দিন ১০-১১
- স্বাস্থ্য কর্মসূচি
  করোনার প্রাথমিক পর্যায়ে আইডিএফ স্বাস্থ্যসেবা ১২-১৩
- হালদা নদী সংবাদ
  করোনায় শুভ বার্তা দিল হালদাঃ এক যুগে সবচেয়ে বেশি ডিম সংগ্রহ ১৪-১৫
- এক নজরে কিছু কার্যক্রম ১৬

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা : ফজলুল বারি
সম্পাদক : জহিরুল আলম
সদস্য : শাম্মী মার্জিয়া
সম্পা সাহা
মৌসুমী চাকমা
শামীম উদ দোহা
মোঃ খালেদ হোসেন

প্রচ্ছদ

মোঃ নাজমুল ইসলাম রুদ্র

দুর্গম পাহাড়ী জনপদে ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনের সংগ্রামে আমরা অবিচল

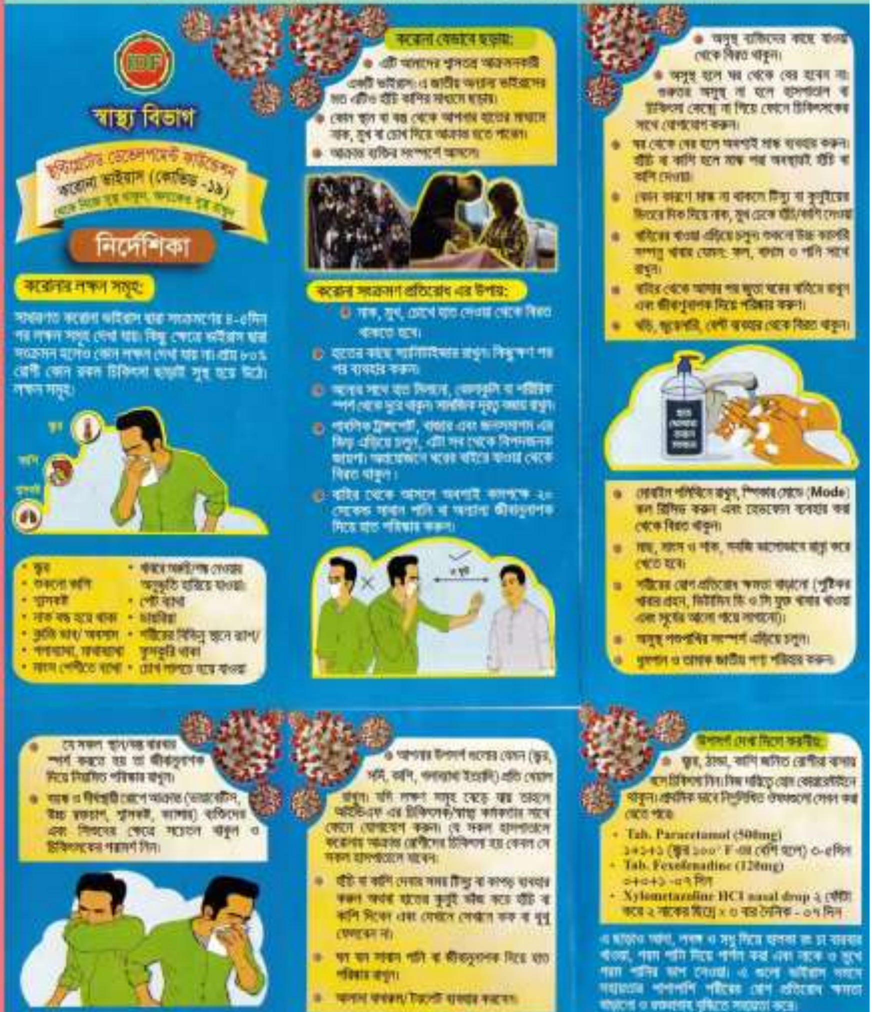

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন

ত্রাণ কার্যক্রম

৮ মার্চ ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে প্রথম করোনা সনাক্ত হওয়ার পর মানুষ যখন আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ে তখনই আইডিএফ, একটি বেসরকারি সংস্থা হিসেবে মানুষের জন্য বিশেষ করে সংস্থার সদস্যদের জন্য মানবিক সাহায্য-সহযোগিতায় নানাভাবে এগিয়ে আসে। জনসাধারণের মাঝে করোনা সতর্কতা এবং সচেতনতা সৃষ্টির জন্য আইডিএফ স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে একটি লিফলেট তৈরী করে এবং তা বিতরণ করে। করোনার প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী সংগ্রহ করে তা বিতরণ করে। শ্রমজীবী এবং অতি দরিদ্রের মাঝে নিত্য প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেয়। নগদ অর্থও প্রদান করা হয় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। করোনার জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য প্রাথমিকভাবে যা যা করা দরকার তার সকল ব্যবস্থাই গ্রহণ করে আইডিএফ। এসকল বিষয় নিয়েই আরও একটু বিশদ বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল।

করোনাকালীন সময়ে আইডিএফ এর মানবিক সাহায্য-সহযোগিতা

করোনা সচেতনতায় আইডিএফ লিফলেট

বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের কারণে উদ্ভূত দুর্যোগকালীন সময়ে জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টিতে আইডিএফ যেসকল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে অন্যতম হল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ক সতর্কীকরণমূলক লিফলেট বিতরণ। আইডিএফ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের ও স্থানীয় জনগণের মাঝে এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৪০ হাজার সতর্কীকরণমূলক লিফলেট তার কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় বিতরণ করেছে। সদস্যদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টিতে উক্ত লিফলেট এ করোনার লক্ষণসমূহ, করোনা কিভাবে ছড়ায়, করোনা সংক্রমন প্রতিরোধের উপায় এবং আক্রান্ত হলে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। জরুরী অবস্থায় চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ ও যেকোন পরামর্শের জন্য তিনজন ডাক্তারের যোগাযোগ নাম্বারও লিফলেট এ প্রদান করা হয়। এছাড়াও দুর্যোগকালীন সময়ে কেন্দ্রসমূহে গিয়ে কর্মীদের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সদস্যদের সচেতন করা হয়েছে। এভাবে করোনা প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় স্বাস্থ্যবিধি মানা ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য জনগণকে সচেতন করার মাধ্যমে জনসচেতনতামূলক কাজ করে যাচ্ছে আইডিএফ।

করোনার সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে জনসচেতনতার পাশাপাশি আইডিএফ মাঠ পর্যায়ে কর্মীদের মাধ্যমে সদস্যদের মাঝে করোনা সুরক্ষা সামগ্রী যেমন: হ্যান্ড স্যানিটাইজার, লিকুইড হ্যান্ডওয়াশ, সাবান, মাস্ক, গ্লাভসসহ ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। এ পর্যন্ত সদস্য পর্যায়ে ১০ হাজার মাস্ক এবং ১২ হাজার স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে যা অদ্যাবধি অব্যাহত আছে। পাশাপাশি সেবাদানকারী চিকিৎসকদের সুরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পিপিই সরবরাহ করা, ডাক্তারদের নিজেদের গেস্টরুম প্রদান, হাসপাতালে জরুরী যন্ত্রপাতি প্রদান, হাসপাতালের আইসোলেশনে সহায়তা প্রদানসহ অন্যান্য সেবা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। এছাড়াও কর্মএলাকায় ২৫০০ টি হাত ধোয়ার স্থাপনা প্রদান করাসহ ১৩৫০০ জন সদস্যকে এ পর্যন্ত বিনামূল্যে ঔষধ সেবা প্রদান করা হয়েছে। এভাবে আইডিএফ এর স্বাস্থ্যকর্মীগণ স্থানীয় জনগণের মাঝে স্বাস্থ্যসেবা ও বিনামূল্যে সেবামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এছাড়াও আইডিএফ বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় প্রশাসনকেও বিভিন্ন সেবামূলক কাজে সহযোগিতা করেছে।

দুস্থ ও দরিদ্রের মাঝে নিত্য প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

আইডিএফ প্রান্তিক পর্যায়ে অসহায় দুস্থ এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে, তাই করোনাকালীন এ দুর্যোগেও মানবিক সেবা প্রদানে সংস্থাটি মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আইডিএফ চট্টগ্রাম ও রাজশাহী জেলায় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের ত্রাণ তহবিলে সহযোগিতা প্রদানসহ ইতোমধ্যে ৩,৮০০ জন অতিদরিদ্র মানুষের মাঝে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন: চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, লবণ, তেল ইত্যাদি সামগ্রী নিরাপদ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিতরণ করেছে এবং এই কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এসব ত্রাণ বিতরণে সমাজের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা স্বতস্ফূর্তভাবে উপস্থিত থেকে সহযোগিতা করেন।

নগদ অর্থ প্রদান :

করোনা ভাইরাসের আকস্মিক আবির্ভাব পুরো বিশ্বের গতিশীলতাকে স্থবির করে দিয়েছে। ধনী থেকে গরীব, সকল শ্রেণীর মানুষের চলমান আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক বিপর্যয় নেমে এসেছে। বিশেষত একেবারে প্রান্তিক অর্থনীতির শ্রমজীবি মানুষ, যারা দিনে আনে দিনে খায় তারা এ মহামারীতে অসহায় হয়ে পড়েছে। আইডিএফ এর সুবিধাভোগী সদস্যদের অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়।

লকডাউন চলাকালীন সময়ে দরিদ্র সদস্যদের বিভিন্ন প্রকল্পসহ সার্বিক আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। শ্রমজীবি সদস্য যারা রিকশা, অটোরিকশা, ভ্যানচালক তথা নিম্ন আয়ের মানুষ, তাদের কাজ বন্ধের ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে। সদস্যরা তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের যথাযথ মূল্য পায় নি। দেশের সর্বত্রই উৎপাদিত বা প্রস্তুতকৃত পণ্যের সরবরাহ চেইন নষ্ট হওয়াতে সদস্যরা তা বাজারজাত করতে পারে নি। সদস্যরা পূঁজি/জমানো মূলধন হারিয়ে তাদের ক্ষুদ্র ব্যবসায় পুঁজি সংকটে ভুগেছে। এমতাবস্থায় আইডিএফ ১,০০০ জন দরিদ্র সদস্যদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ করার মাধ্যমে তাদের ব্যবসায় ঘুরে দাঁড়াতে সহায়তা করেছে।

চেয়ারম্যান, দুর্গাপুর উপজেলা পরিষদ, রাজশাহী এবং অধ্যক্ষ-দুর্গাপুর মহিলা ডিগ্রী কলেজ, আইডিএফ-দুর্গাপুর শাখা কর্তৃক আয়োজিত করোনাকালীস ত্রাণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে ত্রাণ বিতরণ করেন।

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে আইডিএফ এর সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর একদিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা প্রদান করেছে। এছাড়াও করোনা ভাইরাসের কারণে সারাদেশব্যাপী লকডাউনকৃত সময়ে আইডিএফ এর কর্মকর্তা/কর্মীগণ তাদের কর্মস্থল ত্যাগ না করে স্ব স্ব শাখায় নিরাপদে অবস্থান করেছেন এবং টেলিফোনে সদস্য ও তাদের পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য সচেতনতাসহ সার্বিক খোঁজ খবর রেখেছে। এভাবে করোনা ভাইরাস মোকাবিলার দেশব্যাপী এই যুদ্ধে আইডিএফ শামিল হয়েছে এবং দেশের দরিদ্র জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে।

মো: মকবুল হোসেন, মেয়র, নওহাটা পৌরসভা, রাজশাহী, আইডিএফ, নওহাটা শাখা কর্তৃক আয়োজিত করোনাকালীন ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে ত্রাণ বিতরণ করেন।

করোনার শুরুতে আইডিএফ এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা

আইডিএফ যে সকল কাজ করে তার মধ্যে দরিদ্র সদস্যদের ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা দিয়ে তাদের বিনিয়োগ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে আরও ঋণের সরবরাহ করা একটি অন্যতম কাজ। অথচ সম্প্রতি এই কাজটি প্রচন্ডভাবে বাধাগ্রস্থ হয়েছে করোনার কারণে। মার্চ ৮, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশে প্রথম করোনা সনাক্ত হওয়ার পর দেশের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের জীবনযাত্রা, চলাফেরা, কর্মচাঞ্চল্য ও আর্থসামাজিক অবস্থায় বিরাট পরিবর্তন আসে। সরকারও এ বিষয়ে সতর্কতা জারি করে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার উপর কড়াকড়ি আরোপ করে। সারাদেশে মানুষের চলাচল সীমিত করে দেওয়া হয়। করোনার বিস্তার ঠেকাতে ২৬ মার্চ সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে সরকার। লকডাউনে বন্ধ হয়ে যায় গণজমায়েত, পাবলিক পরিবহন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ সব ধরণের অফিস। এক নির্দেশে বেসরকারি সংস্থার মাঠ পর্যায়ের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এপ্রিল ও মে মাসে বন্ধ রাখা হয়। জুন মাস থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কার্যক্রম শুরু হলেও মানুষের মধ্যে ভয়ভীতি এবং আতঙ্ক থেকেই যায়। এরই ভিতর দিয়েই মানুষের জীবিকার কাজ চলতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে কিভাবে মাঠ পর্যায়ে কাজ করা হয় তার একটি চমৎকার অভিজ্ঞতার কথা লিখে পাঠিয়েছেন বহদ্দারহাট শাখার শাখা ব্যবস্থাপক রেখা আক্তার। আইডিএফ পরিচালিত ১৮টি জেলার ১০৮টি শাখায় পরিচালিত কাজের এ যেন পরিচিত ছবিই ফুটে উঠেছে।

করোনা কালীন সময়ে ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনায় একজন শাখা ব্যবস্থাপকের অভিজ্ঞতা

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সাল হতে আইডিএফ এর পদযাত্রা শুরু। সেই হতে এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান তার সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মী বাহিনী দ্বারা কাজের প্রসার ও প্রচারের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে সারাদেশে এর ১০৮ টি শাখা অফিস রয়েছে। বহদ্দারহাট শাখা এদের মধ্যে অন্যতম একটি শাখা। ১৯৯৭ সালের ১ লা জানুয়ারি হতে বহদ্দারহাট শাখার কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে অর্থাৎ মার্চ ২০২০ সময়ে শাখার মোট কেন্দ্র ১০৯টি, মোট গ্রুপ ৬১৮টি, মোট সদস্য ২১৪৭ জন, মোট ঋণী ১৬০৫ জন, মোট ঋণ স্থিতি ৫,৮৩,৬২,৯৭৯ টাকা। মোট সঞ্চয় স্থিতি ২,৯৮,৪৭,৫৮৯ টাকা এবং মোট বকেয়া ৮,৪০,২৭৪ টাকা।

বাংলাদেশে করোনার সর্বপ্রথম রোগী সনাক্ত হয় ৮ মার্চ, ২০২০। ৮ মার্চের পর দেশের আর্থসামাজিক অবস্থায় যে পরিবর্তন বা প্রভাব পড়েছে, আইডিএফ বহদ্দারহাট শাখাও তার ব্যতিক্রম নয়। নিয়ম মেনে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম, কেন্দ্র পরিচালনা, শাখা ব্যবস্থাপনা ও কেন্দ্র পরিদর্শনসহ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। আমরা জানি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে গ্রুপ, কেন্দ্র, কেন্দ্র মিটিং, সামাজিক সহযোগিতার কোন বিকল্প নেই। অথচ করোনা পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়ার জন্য আমি ২ টি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করি।

১. সহকর্মীদের সুরক্ষা
২. স্বাস্থ্যবিধি মেনে কেন্দ্র পরিচালনা।

১. সহকর্মীদের সুরক্ষা : যেহেতু সহকর্মীরাই আমার যুদ্ধের সৈনিক, সেহেতু তাদের স্বাস্থ্যসুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল। শুরুতেই অফিসে কাজের পরিবেশটি স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরী করি। প্রত্যেক সহকর্মীর টেবিল নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে বসানো হয়। সহকর্মীদের প্রত্যেককে অফিসের পক্ষ থেকে মাস্ক, চশমা, হ্যান্ড স্যানিটাইজার দেয়া হয়েছে। অফিসের প্রবেশদ্বারে স্যানিটাইজার স্প্রে বোতল তৈরী করে রাখা হয়েছে, যাতে প্রত্যেকে অফিসে প্রবেশের পূর্বে স্প্রে করে নিতে পারেন। প্রত্যেক সহকর্মীকে ২ জোড়া স্যান্ডেল ব্যবহার করতে বলা হয়, যাতে বাহিরের স্যান্ডেল নিয়ে অফিসের ভিতর প্রবেশ করতে না হয়।

স্বাস্থ্য সুরক্ষার পাশাপাশি সহকর্মীদের মনোবল ধরে রাখার বিষয়টি খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রেখেছিলাম। তাদের মনোবল আর সহযোগিতার কারণেই আজ আমরা ৬ মাস যাবত করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করে কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস পাচ্ছি।

সহকর্মীদের সুরক্ষা তথা অফিসের সুরক্ষায় অফিসে জন সমাগম এড়ানোর বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে। ঋণ বিতরণ বা অন্যান্য লেনদেনের জন্য সদস্যাদের দ্বারা অফিসে যাতে ভিড় না হয় সেজন্য বিতরণগুলো টাইম

শিডিউল করে রাখা হয়, একই সময়ে এসে অফিসে জমায়েত এড়ানোর জন্য।

২. স্বাস্থ্যবিধি মেনে কেন্দ্র পরিচালনা : করোনা মহামারীতে যেখানে একঘরের লোকের অন্যঘরে প্রবেশ মানা, এই ধরণের পরিস্থিতিতে কেন্দ্রঘরে সদস্যদের কিস্তির টাকা পৌছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কেন্দ্রঘরে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাবান ও পানি কেন্দ্রঘরের দরজায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে করে সকল সদস্য সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে কেন্দ্রঘরে প্রবেশ করতে পারেন। তাছাড়া প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কেন্দ্র পরিচালনা নিয়ে জুলাই ২০২০ মাসে যে নতুন অফিস অর্ডার করা হয় তাতে বলা হয় যে, সকল সদস্যার কেন্দ্রে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয় এবং শুধুমাত্র গ্রুপ চেয়ারম্যানদের উপস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কেন্দ্র মিটিং বা ঋণ প্রস্তাব হবে। উক্ত অফিস অর্ডারটি অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল এবং মাঠপর্যায়ে আমাদের সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া সদস্যদের মাঝে করোনা বিষয়ক লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। এতে করে সদস্যদের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা ও আন্তরিকতা বেড়েছে।

ঋণ আদায় হার : করোনা মহামারীর কারণে দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তাছাড়া চট্টগ্রাম করোনার ২য় হটস্পট এ পরিণত হয়েছিল। নগরীর বেশ কিছু এলাকা লকডাউনের আওতায় চলে যায়। যার প্রভাব পড়ে বিভিন্ন পেশাজীবি মানুষের আয়ের উপর। বেশিরভাগ পেশাজীবি মানুষরাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বিশেষ করে গাড়িচালক, কাপড়ের দোকান, প্রসাধনী সামগ্রীর দোকান, জুতার ব্যবসা, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, টেইলার্স, সেলুন, বিউটি পার্লার, চায়ের দোকান, জুয়েলার্স এর দোকান ইত্যাদি পেশাজীবিরাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন বেশি। এ সমস্ত পেশায় যারা নিয়োজিত ছিলেন তারাই কিস্তি চালাতে অসুবিধায় পড়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যারা ভাড়াঘরের জন্য ঋণ নিয়েছেন তারাও কিস্তি দিতে পারছেন না কারণ ভাড়াটিয়ারাও ঠিক সময়ে ভাড়া দিতে পারছেন না। বহদ্দারহাট শাখার প্রায় ৭০ ভাগ ঋণী এসব শ্রমজীবি/ পেশাজীবির হওয়ায় শাখার আদায় হারে প্রভাব পড়েছে। জুন/২০২০ মাসে শাখার আদায় হার ছিলো ৫৯%; জুলাই/২০২০ মাসে যা বেড়ে দাঁড়ায় ৭২%। (এপ্রিল, মে মাসে কার্যক্রম বন্ধ ছিল সরকারী আদেশে)

সঞ্চয় আদায় ও ফেরত হার : অন্যান্য সময়ের তুলনায় বর্তমানে সঞ্চয় আদায়ের হার অনেক কম এবং ফেরতের হার অত্যন্ত বেশি। যেসব পেশাজীবি মানুষের আয় বন্ধ হয়ে গেছে বা কমে গেছে তারা জীবনধারণ করে চলার জন্য সঞ্চিত অর্থের দিকে হাত বাড়াচ্ছে। এতে করে বিপুল পরিমাণ সঞ্চয় ফেরত দিতে হচ্ছে। তাছাড়া যেসব ঋণী আর কিস্তি চালাতে পারছেন না তারা তাদের জমাকৃত সঞ্চয়ের সাথে সমন্বয় করে দেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে করে শাখার সঞ্চয় আদায়ের চেয়ে ফেরতের পরিমাণ বেশি হচ্ছে।

মাঠ পর্যায়ে ঋণের চাহিদা : মাঠ পর্যায়ে বর্তমানে ছোট ঋণের চাহিদা বেশী। অল্প পূঁজি দিয়ে কিছুকরণ বা ব্যবসায় অল্প বিনিয়োগে আগ্রহী বেশিরভাগ ঋণী। বড় ঋণের চাহিদা আপাতত কমে গিয়েছে।

মনিটরিং : একজন শাখা ব্যবস্থাপকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজের অংশ হলো মনিটরিং বা পর্যবেক্ষণ। যেহেতু করোনা পরিস্থিতিতে মাঠ পরিদর্শন ও সরেজমিনে পরিদর্শনের অবাধ সুযোগ ছিল না তাই, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে মনিটরিং কার্যক্রম চালানো হয়েছে। প্রতিদিন বকেয়া সদস্যদের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা হচ্ছে। এতে করে সদস্যদের সাথে অফিসের দূরত্ব তৈরী হওয়ার সুযোগ ছিল না। তাছাড়া যোগাযোগের কারণে শাখার সকল ঋণীদের বিষয়ে অবগত আছি এবং এটি শাখার OTR বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

কর্মএলাকায় করোনা পরিস্থিতি : বহদ্দারহাট শাখা নগরীর চাঁন্দগাও এলাকায় অবস্থিত। শুরু থেকে চাঁন্দগাও করোনার হটস্পট বলে পরিচিতি পায়। শাখার ১০৯ টি কেন্দ্রের মধ্যে ২৭ টি কেন্দ্র এখনও রেডজোনের আওতাধীন। এসব কেন্দ্র

এলাকাগুলোতে চলাফেরার বিধিনিষেধ মেনে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে। শাখার প্রায় ১৭ জন সদস্য করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এবং ৩৫০ জন সদস্য করোনার উপসর্গ নিয়ে অসুস্থ হয়েছেন যাদের মধ্যে ২ জন সদস্য ইতঃপূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। লকডাউনের কারণে কিছু সদস্যের পারিবারিক আয় উপার্জন বন্ধ থাকায় শাখার ১৪ জন সদস্যকে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

লকডাউনের শুরুতে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা

লকডাউনের পর শুরুর দিকে মাঠে কার্যক্রম পরিচালনা খুব চ্যালেঞ্জের ছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীনও হতে হয়েছে। দুএকটি উদাহরণ দিতে চাই। যেমন, দীর্ঘ ২ মাস লকডাউনে থাকার পর মে মাসের ৩০ তারিখ হতে MRA ও PKSF এর নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্যবিধি মেনে আমরা কেন্দ্র কালেকশন শুরু করি। কালেকশনে গিয়ে কেন্দ্রের পরিবেশ, সদস্যদের ব্যবহার সবকিছু দেখে মনে হয়েছে নতুন এলাকায় এসেছি আমরা। যে কেন্দ্রঘরে বছরের পর বছর কেন্দ্র মিটিং করে এসেছি সেই কেন্দ্রঘরেই ঢোকা বারণ করে দিলেন সবাই। "ঘরে ঢোকা যাবে না, বাইরে বসতে হবে।" সময়টা বর্ষাকাল যাচ্ছিল। কর্মীরা কোথাও হয়তো কারও ঘরের কার্নিশের নিচে বসার সুযোগ পেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাইরে বৃষ্টিতে ভিজে এক হাতে ছাতা নিয়ে আরেক হাতে কালেকশান করেছে। সে এক তিক্ত অভিজ্ঞতা।

শুধু যে কেন্দ্রঘরে বসার সমস্যায় পড়তে হয়েছে তা নয় কিছু কিছু জায়গায় আমাদেরকে এলাকায় প্রবেশ করতেও বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তির সহায়তায় ও সদস্যদের সমর্থনে এ ধরণের পরিস্থিতি সামাল দিয়েছি। তবে ১ টি ঘটনার কথা না বললেই নয়। আমার শাখার ২০ নং কেন্দ্রে প্রথম যেদিন কালেকশনে পাঠাই মাঠকর্মীকে তখন মাঠকর্মী কেন্দ্রে পৌঁছানোর আগেই পাড়ার রাস্তায় তাকে স্থানীয় জনগণ ঘিরে ধরে এবং তাকে হুমকি দেয়,"এলাকায় প্রবেশ করা যাবে না, বের হয়ে যান। যতদিন না করোনা যাবে ততদিন আপনি আসবেন না।" আশ্চর্যজনকভাবে কেন্দ্রের সদস্য ও অভিভাবকরা নীরব ভূমিকা পালন করেছিল। মাঠকর্মী উত্তেজিত জনতাকে অনেক চেষ্টা করেছিল এটা বোঝাতে যে, "আমি কালেকশান করতে আসিনি, আমাদের সদস্যারা সুস্থ আছেন কিনা খোঁজ খবর নিতে এসেছি, কেউ কিস্তি দিতে চাইলে নেব, অন্যথায় নয়।" কিন্তু কেউ তার কথা শুনতে নারাজ। একপর্যায়ে উৎসুকজনতার কয়েকজন মাঠকর্মীকে ধাক্কা দিয়ে টেনেহিচড়ে এলাকা থেকে বের করে দেন। আমি তৎক্ষণাৎ কর্মীকে নিয়ে কমিশনার এর বাসায় যাই। পুরো বিষয়টি তাকে অবহিত করি এবং তিনি বিষয়টি সুরাহা করেন। যারা এ কাজটি করেছেন তারা ক্ষমা চেয়েছেন এবং পরবর্তীতে এমন আচরণ আর কেউ করেননি।

মাঠের প্রতিবন্ধকতা ব্যতীত অফিসেও কম তিক্ত পরিস্থিতি সামলাতে হয় নি। তার মধ্যে অন্যতম হল প্রতিদিন ২০-৩০ জন অফিসে এসে বসে থাকতো সঞ্চয় ফেরত নেয়ার জন্য। প্রত্যেকেই বড় অংকের সঞ্চয় ফেরত নেয়ার আবেদন করতো। এসব সদস্যদের মধ্যে কয়েকজনকে বোঝাতে পারলেও বেশিরভাগ সদস্যদের বোঝানো সম্ভব হতনা। তাদের চাহিদা আর আমার অসহায়ত্বের কারণে মাঝে মাঝে অফিসে অপ্রীতিকর কথা শুনতে হয়েছে সদস্যদের কাছ থেকে।
তবে সময়ের সাথে সাথে মাঠ পর্যায়ে সদস্যরা করোনা পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে, জনমনেও করোনা আতঙ্ক কমে গেছে এবং সেই সাথে ধীরে ধীরে সবকিছু স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে আসছে। একটা সময় হয়তো সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে, তবে মহামারীকালীন ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনার অভিজ্ঞতাটুকু থেকে যাবে। কিন্তু সহকর্মীদের নিষ্ঠা আর সদস্যদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিকতার কারণে সবধরণের বাধা বিপত্তি কাটিয়ে বর্তমানে শাখার কার্যক্রম পরিচালনা করছি।

পরিশেষে বলতে চাই, এতকিছু খারাপ অভিজ্ঞতার পাশাপাশি ভাল অভিজ্ঞতাও অর্জন করতে পেরেছি। তা হলো বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলা করে তীব্র প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কিভাবে শাখাকে টিকিয়ে রাখতে হয়, কিভাবে কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়া যায়। এ অভিজ্ঞতা একজন শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে আমাকে আগের চেয়েও অনেক দৃঢ় ও সাহসী ব্যবস্থাপক হিসেবে গড়ে তুলেছে। প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রায় সব ধরণের প্রতিকুল পরিস্থিতিতে নিজেকে সামিল রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

রেখা আক্তার (১৬৭৪)
শাখা ব্যবস্থাপক, বহদ্দারহাট শাখা।

প্রবন্ধ

করোনা ভাইরাস সনাক্ত হওয়ার প্রথম দিকে মানুষ একটি অজানা, অচেনা আতঙ্কের মধ্যে পড়ে যায়। সরকার লকডাউন ঘোষণা করলে মানুষ উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় ঘরবন্দী দিনাতিপাত শুরু করে। এরপর লকডাউন শিথিল করা হলেও মানুষের ভীতি এবং আশঙ্কা থেকেই যায়। অফিস আদালত, দোকানপাট খোলা হলেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে মানুষ সতর্কভাবে চলাচল এবং কাজকর্ম শুরু করে। আইডিএফ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দও কাজে নামেন। আইডিএফ এর মাঠকর্মীগণ কাজ করতে গিয়ে অসুবিধায় পড়েন দু'ভাবে। নিজেদের মধ্যে আতঙ্ক থাকে আবার এলাকার মানুষরাও নানা বাঁধার সৃষ্টি করে। এতদপ্রেক্ষিতে আইডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম কোভিড চলাকালীন সময়ে সংস্থার শাখা ব্যবস্থাপক, এরিয়া ব্যবস্থাপক ও যোনাল ম্যানেজারদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত এক ভার্চুয়াল মিটিং এ *কোভিড পরিস্থিতিকে যুদ্ধতুল্য ঘোষণা করেন এবং এ যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানান। নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের এ ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জনাব মোঃ সেলিম উদ্দীন, পরিচালক (ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি)* "কোভিড যুদ্ধে আমাদের জয়ী হতে হবে" এবং "কোভিড পরিস্থিতিতে আইডিএফ কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পর্যালোচনা" সংক্রান্ত প্রবন্ধ রচনা করেন যা নিম্নে প্রকাশ করা হল।

১. কোভিড যুদ্ধে আমাদের জয়ী হতে হবে

"কোভিড যুদ্ধে আমাদের জয়ী হতেই হবে।" নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের এ ঘোষণাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য জনাব মোঃ সেলিম উদ্দীন এ ঘোষণার সাথে একাত্ম হয়ে সংস্থার সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে উজ্জীবীত হয়ে কাজ করার জন্য উল্লেখ করেন যে, আইডিএফ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম। প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতেই স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করার অসামান্য সক্ষমতা রয়েছে আমাদের ক্ষুদ্র ঋণ এর সাথে সম্পৃক্ত যোদ্ধাদের। কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে আমাদের সদস্যরাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এটা অনস্বীকার্য। তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দিনমজুর ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগোষ্ঠী, যারা দৈনিক আয়ের ওপর নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাধার কারণে দেশের বেশির ভাগ পরিবারের আয় কমে গেছে, বিশেষত দরিদ্র পরিবারগুলোর যারা অপ্রাতিষ্ঠানিক অকৃষিকাজের (যেমন নির্মাণকাজ ও গ্রামীণ অকৃষি খাত) ওপর নির্ভরশীল। এই পরিবারগুলোর বেশির ভাগই তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য আইডিএফ এর ঋণ ও অন্যান্য কর্মসূচি থেকে সহায়তা লাভ করে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের জন্য একটি বড় অনিশ্চয়তা হচ্ছে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নির্ধারণ করা। কারণ আগামী দিনগুলোতে ঠিক কত সময়, কত শক্তিশালীভাবে কোভিড-১৯-এর সংকট অব্যাহত থাকবে, তা আমাদের অজানা। এ পরিস্থিতিতে কোভিড-১৯-এর প্রভাব থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের বেশ কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন।

ক। নগদ অর্থপ্রবাহের অন্যতম নির্ভরযোগ্য উৎস হচ্ছে ঋণ আদায় বেগবান করা (recovery efficiency)।

খ। এর পরই রয়েছে ঋণগ্রহীতার সঞ্চয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ। অন্যদিকে অর্থের প্রধান প্রধান ব্যয়ের খাত হচ্ছে ঋণ বিতরণ, ঋণদাতার ঋণ পরিশোধ, কর্মীদের বেতন প্রদান এবং অফিস ও অন্যান্য ব্যয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে ঋণ পরিশোধের মতো গুরুত্বপূর্ণ উৎসটি সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ব্যাংকগুলোও ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে একটা 'দেখি না কি হয়' এই ভাবধারার মধ্যে রয়েছে বলেই আমার কাছে মনে হয়।

অতীতে আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ঋণ পরিশোধের হার তুলনামূলকভাবে দ্রুতগতিতে (কয়েক মাসের মধ্যে) পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলাম। বর্তমানেও এটা করা সম্ভব হবে বলে দৃঢ়ভাবে আমাদের সহকর্মীদের প্রতি আস্থা রাখি। এও বিশ্বাস করি, তারা ঋণ বিতরণ আরো ভালোভাবে তদারকি করবেন এবং এই মুহূর্তে হাই সিলিং এ বিতরণ বৃদ্ধি না করে অধিক ঋণীকে ঋণ বিতরণের মাধ্যমে বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট থাকবেন এবং আদায় নিশ্চিত করে,অভ্যন্তরীণ উৎস হতে অর্থ প্রবাহ বাড়িয়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এর উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে এনে কয়েক মাসের মধ্যেই তহবিল সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন যা আমাদের নগদ অর্থপ্রবাহ সঠিকভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে ।

গ। সকলের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন যে, আমাদের কর্মীদের বেতন, অফিস ব্যয়, ঋণদাতাদের ঋণের কিস্তি এবং অন্যান্য নিয়মিত ব্যয় বহন করতে হচ্ছে। তাই টিকে থাকার জন্য এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে আমাদেরকে আরো ব্যয়সাশ্রয়ী কীভাবে হওয়া যায়, সে বিষয়গুলো বিবেচনা করে বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা নেয়া জরুরি বলে আমার কাছে মনে হয়।

আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো মহামারীর পরে আমাদের কার্যক্রমের টেকসইতা সুরক্ষা করা। তবে বর্তমান নভেল করোনাভাইরাস সংকটের জন্য, সংকটের পরিমাণ এবং সময়কালের ওপর নির্ভর করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্য আরো কয়েক মাস সময় হয়তো লাগতে পারে; যা পুরোটাই অনিশ্চিত এবং পরবর্তী কোভিড-১৯ পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। তবে দ্রুততার সঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাওয়ার জন্য এখন থেকেই আমাদের প্রতিদিন সকল স্তরের কর্মকর্তাদের সিরিয়াস থাকতে হবে, এর কোন বিকল্প নেই।

অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র অর্থায়ন গ্রহীতারা সাধারণত তাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পুনরুদ্ধারে বেশ দ্রুত অগ্রসর হতে পারে। তাই ঝুঁকিপূর্ণ পোর্টফোলিও আগামী দুই এক মাসের মধ্যে সহনীয় মাত্রায় আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি। যদিও বর্তমান পরিস্থিতিতে হয়তো আমাদের কিছু কুঋণের মুখোমুখি হতে হবে, ঋণের চাহিদা বেড়ে গেলে (যেহেতু গ্রাহকদের তাদের ব্যবসা পুনঃস্থাপনের জন্য তারল্যের প্রয়োজন) এই লোকসানের ক্ষতিপূরণ করা খুব একটা কষ্টকর হবে না।

কিছু ঋণগ্রহীতার অবশ্য ঋণ পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হতে পারে, যার জন্য ঋণ পরিশোধের সময়কাল কিছুটা বাড়ানো প্রয়োজন হতে পারে। এজন্য কিস্তিগুলো কিছুটা নমনীয় করা যেতে পারে। তবে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে এটা বলা যায় যে বেশির ভাগ বকেয়া ঋণ আমাদের ফিরে আসবে এবং ফিরে আনতেই হবে। এটিই আমাদের এই সময়ে যুদ্ধ। এই যুদ্ধে আমাদের জয়ী হতেই হবে আমাদের প্রাণপ্রিয় সংস্থা ও আমাদের সবার স্বার্থে। আমি বিশ্বাস করি এরই মধ্যে গ্রাহকদের

আর্থিক তারল্যের চাপের সঙ্গে মোকাবেলার কার্যকর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, যা বর্তমান পরিস্থিতিতে নিঃসন্দেহে তাদের কৌশল নির্ধারণ করতে সহায়তা করবে।

নভেল করোনাভাইরাস থেকে সংক্রমণের আশঙ্কা নিঃসন্দেহে আমাদের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের মনোবল ও কাজের দক্ষতায় বেশ প্রভাব ফেলেছিল। আমাদের সকলের গৃহীত পদক্ষেপ এই মানসিক শঙ্কা দূর করার জন্য আমাদের কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যেমন স্বাস্থ্যনিরাপত্তা উপকরণ সরবরাহ করা, কর্মী কল্যাণ নীতিমালা অথবা অন্যান্য সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি, তা দূর হয়েছে। মাঠকর্মীগণও তাদের নিজ নিজ কর্ম এলাকায় মহামারীর অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েছে। সিনিয়রদের মাঠের কর্মীদের গাইড করতে হবে এবং তাদের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সাংগঠনিক কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা কৌশল নির্ধারণের জন্য মাঠ স্তর থেকে প্রতিক্রিয়াগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দ্রুততার সঙ্গে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মাঠ কর্মীদের কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে কার্যকর যোগাযোগকারী এবং তাদের সদস্যদের কাছে রোল মডেল হিসেবে গণ্য করার ব্যবস্থা গ্রহণ যথেষ্ট সুফল বয়ে আনবে ।

ঘ। কর্মীদের নিজের সুরক্ষার পাশাপাশি গ্রাহকদের কাছে সর্বোত্তম অনুশীলনগুলো তুলে ধরার ব্যবস্থা মাঠ পর্যায়ে অধিক ভূমিকা রাখবে। অতীতেও আমরা অনেক চ্যালেঞ্জ ও সংকটের সম্মুখীন হয়েছি। পরবর্তী সময়ে আরো শক্তিশালী হয়ে আমাদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছি। কোনো সন্দেহ নেই যে কোভিড-১৯ ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতের জন্য একটি গুরুতর সংকট। তবুও অতীতের অভিজ্ঞতায় আমি বিশ্বাস করি, সফলতার সঙ্গে এই সংকটের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জন আমরা করেছি । ফলে আরো দক্ষতার সঙ্গে আমরা লাখ লাখ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত সদস্যের প্রয়োজনীয় এই সেবা প্রদানের অতীত সাফল্যকে আরো উজ্জ্বলতর করতে সক্ষম হবো।

২. কোভিড পরিস্থিতিতে এনজিও কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পর্যালোচনা

বর্তমান কোভিড ১৯ এর প্রভাবজনিত পরিস্থিতিতে কালেকশন করতে প্রত্যেকেই ভয়, চাপ, কিংবা উদ্বেগ অনুভব করছে বলেই সংশ্লিষ্ট সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করে অনুভূত হচ্ছে। সাধারণ অনুভূতি বা মানসিক অবস্থা বোঝাতে গিয়ে আমরা ভয়, চাপ এবং উদ্বেগ এই জাতীয় শব্দ ব্যবহার করি। এই তিনটি মানসিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে মাঠপর্যায়ে কর্মরতদের অবস্থা বোঝা প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতাদের স্থানীয় প্রশাসন এবং এনজিও সংশ্লিষ্টদের। ভয় বলতে Worry, চাপ বলতে Stress এবং উদ্বেগ বলতে Anxiety-কে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এগুলো প্রত্যেক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে ভয়ানকভাবে বিরাজ করছে।

ভয় (Worry)

কালেকশনে যাওয়ার পূর্বে একজন মাঠকর্মী স্থানীয় প্রশাসন, চেয়ারম্যান, মহল্লার নেতা ও খেলাপি ঋণীদের নেতিবাচক আচরণ বা অযাচিত ব্যবহারের ভয়ে দারুণভাবে প্রভাবিত হচ্ছে এবং অনিশ্চিত পরিণামের কথা ভেবে কিংবা কী কী অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটতে পারে এসব চিন্তা করে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে যা তাদের উপর ভয়ের প্রভাব ফেলছে। কর্মীদের মনে রাখা প্রয়োজন যে ভয় হচ্ছে একটি পুনরাবৃত্তিমূলক অনুভূতি যার সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক স্বভাবতই ব্যক্তির। তাই অহেতুক ভয় পাবেন না। কারণ অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, ভয় শুধু ব্যক্তির মনেই ঘটে থাকে, শারীরিক কোনো উপস্থিতি এর নেই। ভয় হচ্ছে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের খুব মৌলিক একটি অনুভূতি। যখন আমরা কোনো অনিশ্চিত কিংবা অপ্রীতিকর ঘটনা নিয়ে ভাবতে শুরু করি তখন একে ভয় বলা হয়ে থাকে। ভয় হচ্ছে এমন একটি আবেগ যা আমাদের নির্দিষ্ট সময়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে আমাদেরকে আসন্ন বিপদ থেকে নিরাপদ রাখে। কিন্তু সমস্যাটি তখনই ঘটে যখন একটি বিষয়ে চিন্তা করতে করতে আমরা ভীত হয়ে শেষ অবধি প্রয়োজনীয় কাজটি করার সক্ষমতা হারাই। তাই অহেতুক ভয় না পেয়ে যে বিষয়টি নিয়ে আপনি অতিরিক্ত চিন্তা করছেন সেই চিন্তাটির বদলে অন্য কোনো চিন্তা দ্বারা প্রতিস্থাপন করে ফেলুন।

চাপ (Stress)

স্ট্রেস অনুভব করার জন্য একটি স্ট্রেসরের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। এটি হতে পারে আপনার কেন্দ্রে কম আদায় । ধরুন, লকডাউন শিথিল হবার দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হলেও কেন্দ্র কালেকশনের তেমন কোনো অগ্রগতিই এখন পর্যন্ত নেই। এজন্য আপনার নিজের আয়ত্তের বাইরে যে স্নায়ু উদ্দীপনায় ভুগছেন এটি হলো আপনার স্ট্রেস বা মানসিক চাপ। মানসিক চাপ ব্যক্তির মন ও শরীর দুইয়ের উপরই প্রভাব ফেলে। দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকা কোনো অস্বস্তিকর অনুভূতি। তাই অত্যধিক স্ট্রেস না নিয়ে নিজের কাজ ও চেষ্টা করে যান, দেখবেন অচিরেই সব ঠিক হয়ে গেছে।

উদ্বেগ (Anxiety)

আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এখন সবচেয়ে ভয় ও চাপের মধ্যে আছেন মানে উদ্বেগে আছেন। অর্থাৎ ভয়কে বলা হয় উদ্বেগের কগনিটিভ উপাদান এবং এর শারীরিক প্রতিক্রিয়া হলো স্ট্রেস। অর্থাৎ আপনি কোনো কিছু নিয়ে ভীত হলে আপনার শরীর কোনো না কোনোভাবে সাড়া প্রদান করে। পুরো বিষয়টিকে একত্রে বলা হয় উদ্বেগ। এই কারণেই বলা হয়- উদ্বেগ হলো একটি মনোদৈহিক প্রক্রিয়া। ভয়ের সঞ্চার হয় মনে, আর তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় শরীরে। আপনি যখন যথেষ্ট পরিমাণ ভয় ও স্ট্রেসের সাথে লড়ছেন, মূলত: তখন বলা যেতে পারে যে, আপনি একটি বা একাধিক বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন। উদ্বেগ থাকা অবস্থায় আপনি ভালো কিছু করতে পারবেন না। তাই শারীরিক অনুভূতিকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করুন। মনে রাখা দরকার, উদ্বেগের বিষয় নিয়ে চিন্তা করলে বা এ নিয়ে অন্যের সাথে কথা বললে মুক্তি মিলবে না কোনো মতেই। বরং দড়ি লাফ, গান শোনা, অমসৃণ কাপড়ে হাত ঘষার মাধ্যমে উদ্বেগকে ভিন্ন পথে চালনা করা যায়। তাই গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখার এ সব সৈনিকদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আমাদের সকলের দায়িত্বশীল আচরণই কেবল পারে বৈশ্বিক মহামারীর মধ্যে তাদের একটু মানসিক শান্তি দিতে।

লেখক : মোঃ সেলিম উদ্দীন
পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স)

প্রচ্ছদ কাহিনী

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারীর সূত্রপাত ঘটে ২০১৯ সালের শেষের দিকে চীনের উহান শহর থেকে। বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় মার্চ,২০২০ সালে এবং ক্রমান্বয়ে এর বিস্তার ঘটছে। চলমান এ মহামারীতে দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, কর্মসংস্থানসহ সার্বিক অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়েছে। ভয়াবহ এই মহামারী থেকে জনসাধারণের সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে সারাবিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহও করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় তৃণমূল পর্যায়ে ত্রাণ ও নগদ আর্থিক সহায়তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখে চলেছে। তাই করোনা পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে আইডিএফও পিকেএসএফ এর সহায়তায় বেশ কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এসকল বিষয়ই আমাদের পরিক্রমার এ সংখ্যায় তুলে ধরা হয়েছে। মূলত করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতার কোন বিকল্প নেই। তাই সদস্যদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টিতে আইডিএফ তার কর্মএলাকায় বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি সতর্কীকরণ লিফলেট বিতরণ করেছে। আর তা নিয়েই সাজানো হয়েছে এ সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী।

করোনা ভাইরাস (কোভিড -১৯) থেকে নিজে বাঁচুন, অন্যকেও বাঁচতে দিন

করোনা ভাইরাস এমন একটি সংক্রামক ভাইরাস যা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং বিপদজনক। The International Committee on Taxonomy of Viruses named the virus as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).
এই ভাইরাসের অনেক প্রজাতি আছে, কিন্তু এরমধ্যে মাত্র ৭টি মানুষের দেহে সংক্রমিত হতে পারে। বিজ্ঞানীদের মতে ভাইরাসটি মানুষের দেহে গঠন পরিবর্তন করে নতুন রূপ নেয় এবং সংখ্যা বৃদ্ধি করে যার ফলে এটি আরো বেশি বিপদজনক হয়ে ওঠে।

করোনার লক্ষণ সমূহ

সাধারণত করোনা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমণের ৪-৫ দিন পর লক্ষণ সমূহ দেখা দেয়। কিছু ক্ষেত্রে ভাইরাস দ্বারা সংক্রমণ হলেও কোন লক্ষণ দেখা দেয় না। প্রায় ৮০% রোগী কোন রকম চিকিৎসা ছাড়াই সুস্থ হয়ে উঠে। লক্ষণসমূহ নিম্নরূপঃ

- জ্বর
- শুকনো কাশি
- শ্বাসকষ্ট
- নাক বন্ধ হয়ে থাকা
- ক্লান্তি ভাব/ অবসাদ
- গলাব্যথা
- মাথাব্যথা
- মাংস পেশীতে ব্যথা
- খাবারে অরুচি/ গন্ধ নেওয়ার অনুভূতি হারিয়ে যাওয়া।
- পেট ব্যথা
- ডায়রিয়া
- শরীরের বিভিন্ন স্থানে র‍্যাশ/ফুসকুরি থাকা
- চোখ লালচে হয়ে যাওয়া

করোনা যেভাবে ছড়ায়

১. এটি আমাদের শ্বাসযন্ত্র আক্রমণকারী একটি ভাইরাস, এ জাতীয় অন্যান্য ভাইরাসের মত এটিও হাঁচি কাশির মাধ্যমে ছড়ায়।
২. কোন স্থান বা বস্তু থেকে ব্যক্তির হাতের মাধ্যমে অথবা নাক, মুখ বা চোখ দিয়ে আক্রান্ত হতে পারেন।
৩. আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসলে।

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ এর উপায়

- নাক, মুখ, চোখে হাত দেওয়া থেকে বিরত থাকা।
- পকেটে সবসময় স্যানিটাইজার রাখা এবং কিছুক্ষণ পর পর ব্যবহার করা।
- অন্যের সাথে হাতে হাত মেলানো, কোলাকুলি বা শারীরিক স্পর্শ থেকে দুরে থাকা। সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা।
- পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, বাজার এবং জনসমাগম এর ভিড় এড়িয়ে চলা। এ ধরণের স্থানগুলো ঝুঁকিপূর্ণ। অপ্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়া থেকে বিরত থাকা।
- বাহির থেকে আসলে অব্যশই কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড সাবান পানি বা অন্যান্য জীবানুনাশক দিয়ে হাত (কনুই পর্যন্ত) পরিষ্কার করা।
- অসুস্থ ব্যক্তিদের কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকা।
- অসুস্থ হলে ঘর থেকে বের হওয়া যাবে না, ঘরেই অবস্থান করা। গুরুতর অসুস্থ না হলে হাসপাতাল বা চিকিৎসা কেন্দ্রে না গিয়ে ফোনে চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়ম মেনে চলা।

- ঘর থেকে বের হলে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করা। হাঁচি বা কাশি হলে মাস্ক পরা অবস্থায়ই হাঁচি বা কাশি দিতে হবে।।
- কোন কারণে মাস্ক না থাকলে টিস্যু বা কনুই দিয়ে নাক, মুখ ঢেকে হাঁচি/কাশি দেওয়া।
- বাড়ির বাহিরে খাওয়া এড়িয়ে চলা এবং কর্মস্থলে জল ও খাবার ভাগাভাগি করা থেকে বিরত থাকা। শুকনো উচ্চ ক্যালরি সম্পন্ন খাবার যেমনঃ বাদাম, শুকনো ফল ও পানি সাথে রাখা।
- বাহির থেকে আসার পর জুতা ঘরের বাহিরে রাখা এবং জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করা।
- ঘড়ি, জুয়েলারী, বেল্ট ব্যবহার থেকে আপাতত বিরত থাকা।
- মোবাইল পলিথিনে রাখা, স্পিকার মোড (mode) এ কল রিসিভ করা এবং হেডফোন ব্যবহার না করা।
- মাছ, মাংস ও শাক-সবজি ভালোভাবে রান্না করে খেতে হবে।
- শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো (পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ, ভিটামিন ডি ও সি যুক্ত খাবার খাওয়া এবং সূর্যের আলো গায়ে লাগানো)।
- অসুস্থ পশুপাখির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা।
- ধূমপান ও তামাক জাতীয় পণ্য পরিহার করা।
- যে সকল স্থান/বস্তু বারবার স্পর্শ করতে হয় তা জীবাণুনাশক দিয়ে নিয়মিত পরিষ্কার রাখা।
- বয়স্ক ও দীর্ঘদিন রোগে আক্রান্ত (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসকষ্ট, ক্যান্সার) ব্যক্তিদের এবং শিশুদের ক্ষেত্রে সচেতন থাকা ও চিকিৎসকের পরার্মশ নেওয়া।

আক্রান্ত হলে করণীয়

১. করোনায় আক্রান্ত হলেই হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন নেই বরং নির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে বাড়িতে চিকিৎসা নেয়া যায়।
২. পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে এবং বেশি করে পানি পান করতে হবে।
৩. যদি চিকিৎসক/স্বাস্থ্য কর্মীর কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হয় তবে আক্রান্ত ব্যক্তির লক্ষণ সম্পর্কে পূর্বেই তাদের অবহিত করতে হবে। যাতে তারা যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে।
৪. রোগীর উপসর্গগুলোর (যেমনঃ জ্বর, সর্দি, কাশি, গলাব্যথা ইত্যাদি) প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। যদি লক্ষণসমূহের তীব্রতা বাড়ে, তাহলে চিকিৎসক/স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সাথে ফোনে যোগাযোগ করে করোনা আক্রান্ত রোগীদের সেবা প্রদানকারী বিশেষায়িত হাসপাতালগুলোতেই যেতে হবে।
৫. হাঁচি বা কাশি দেবার সময় টিস্যু বা কাপড় ব্যবহার করতে হবে অথবা হাতের কনুই ভাঁজ করে হাঁচি বা কাশি দিতে হবে। যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে।
৬. ঘন ঘন সাবান পানি বা জীবাণুনাশক দিয়ে হাত পরিষ্কার রাখতে হবে।
৭. আলাদা বাথরুম/টয়লেট ব্যবহার করতে হবে।
১০. বাড়ির অন্যদের থেকে আলাদা কক্ষে থাকতে হবে।
১১. একে অন্যের ব্যবহার্য জিনিসপত্র অবশ্যই আলাদা রাখতে হবে।
১২. সর্বোপরি আতংকিত না হয়ে যথাযথ পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হবে।

উপসর্গ দেখা দিলে করণীয়

জ্বর, ঠান্ডা, কাশির রোগীরা উপসর্গ গুরুতর না হলে বাড়িতেই চিকিৎসা নিতে হবে। নিজ দায়িত্বে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। সদর হাসপাতালে বা চেম্বারে ভীড় করে অন্যদেরকে ঝুঁকির মুখে না ফেলে প্রাথমিকভাবে নিম্নলিখিত ঔষধগুলো সেবন করা যায়।

- Tab. Napa / Paracetamol (500mg)
  ১+১+১ (জ্বর ১০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট এর বেশি হলে) ৩-৫ দিন
- Tab. Fexofenadine (120 mg)
  ০+০+১ - ০৭ দিন
- Xylometazoline HCL nasal drop ২ ফোটা
  করে দুই নাকের ছিদ্রে x ৩ বার দৈনিক (নাক বন্ধ থাকলে) - ৭ দিন

এ ছাড়াও আদা, লবঙ্গ ও মধু দিয়ে হালকা রং চা বারবার খাওয়া, গরম পানি দিয়ে গার্গল করা এবং নাকে ও মুখে গরম পানির ভাপ নিতে হবে। এ গুলো ভাইরাস দমনে সহায়তার পাশাপাশি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো ও রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

স্বাস্থ্য কর্মসূচি

বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস প্রথম শনাক্তকরণের পর এবং লকডাউনে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হলে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কাজটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়। চলাচলে বিধিনিষেধ ও সংক্রমণের ভয়ে এ খাতে সেবা প্রদান করা দুরূহ হয়ে ওঠে। অথচ কাজটি আবশ্যিকভাবে জরুরী হয়ে ওঠে। এ সময় আইডিএফ এর স্বাস্থ্য কর্মীগণ ছুটিকালীন সময়ে টেলিফোনযোগে এবং ছুটি শেষ হলে কর্মকালীন সময়ে স্যাটেলাইট ক্লিনিক এর মাধ্যমে রোগীদের সেবা প্রদান করে। আইডিএফ স্বাস্থ্য বিভাগে ৫৬ জন প্যারামেডিক/স্বাস্থ্য কর্মকর্তা প্রকল্প এলাকায় সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। আইডিএফ এর সিনিয়র প্যারামেডিক সুমন চন্দ্র সরকার চট্টগ্রাম এলাকার বহদ্দারহাট ও মোহরা এ দু'টি শাখায় যেভাবে বিগত ৪ মাসে ছুটিকালীন ও কর্মকালীন সময়ে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছেন তার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন এই প্রবন্ধে। এভাবেই অন্যান্য প্যারামেডিকগণও সেবা দিয়েছেন আইডিএফ এর অন্যান্য এলাকায়।

করোনার প্রাথমিক পর্যায়ে আইডিএফ এর স্বাস্থ্য সেবা

২০১৯ ইং সালের ৩১ শে ডিসেম্বর চীনের উহান প্রদেশে প্রথম করোনা ভাইরাসের একটি প্রজাতির সংক্রমণ দেখা গেলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভাইরাসটিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে NCOV-19 নামকরণ করেন। ২০২০ ইং সালের মার্চ মাসের ৮ তারিখে বাংলাদেশে প্রথম করোনা শনাক্ত হয় এবং ১৮ তারিখে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। ১১ জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশে ১,৮১,১২৯ রোগী সনাক্ত হয় এবং ২৩০৫ জন রোগী মৃত্যুবরণ করে।

জানুয়ারি-জুন ২০২০ সময়ে আইডিএফ এর স্বাস্থ্য সেবা

মহামারীর এই সময়ে চিকিৎসা সংক্রান্তখাতে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় সংক্রমণ ভীতি এবং ঔষধ বা প্রতিষেধক আবিষ্কার না হওয়ায় আক্রান্তের ঝুঁকিও বেড়ে যায়। তবে এই ধরণের ভাইরাসজনিত রোগ হাঁচি, কাশি বা ড্রপলেট থেকে ছড়ায় তাই আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ এড়িয়ে এবং ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে সংক্রমণ এড়িয়ে চিকিৎসা সেবা দেয়া সম্ভব। এটি মেনে আইডিএফ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চালু রেখেছে এবং সদস্যা ও তার পরিবারের অন্যান্যদের সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় ভুমিকা রাখছে। আইডিএফ এর ১০৮টি শাখায় প্যারামেডিক/স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণ টেলিফোনে এবং সরাসরি স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালনার মাধ্যমে সদস্যা ও তার পরিবারের অন্যান্যদের জন্য চিকিৎসা ও পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। আইডিএফ এ কর্মরত প্রত্যেক প্যারামেডিক/স্বাস্থ্য কর্মকর্তা প্রতিদিন বিভিন্ন কেন্দ্রের গ্রুপ প্রধান, কেন্দ্র প্রধান এবং হেলথ এজেন্টদের মাধ্যমে সদস্যা ও তার পরিবারের অন্যান্যদের টেলিফোনে শারীরিক ও মানসিক অবস্থার খোঁজ খবর নিচ্ছেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করে এবং সামাজিক দূরত্ব মেনে সরাসরি অফিস পর্যায় এবং বিভিন্ন জায়গায় স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালনার মাধ্যমে চিকিৎসা ও পরামর্শ অব্যাহত রেখেছে। নিম্নে জানুয়ারি-জুন, ২০২০ সময়ে দুটি শাখায় রোগী দেখার বিবরণ তুলে ধরা হল।

দুটি শাখায় রোগী দেখার সংখ্যা : বর্তমান এই অবস্থায় বিরূপ পরিস্থিতি এবং এই পরিস্থিতির পূর্ববর্তী সময়ে আইডিএফ বহদ্দারহাট শাখা ও মোহরা শাখার অধীন গত ১লা জানুয়ারি ২০২০ থেকে ৩০ শে জুন পর্যন্ত মোট ১১৩৪ জনকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ৯৩৪ জন (৮২.৪%) মহিলা এবং ২০০ জন (১৭.৬%) পুরুষ রোগী (তালিকা ১)।

তালিকা ১. জানুয়ারি-জুন ২০২০ তারিখে রোগীর সংখ্যা

বিবরণ	ছুটিকালীন সময়			কর্মকালীন সময়			মোট		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
সদস্য	-	১০৩	১০৩	-	৫৩১	৫৩১	-	৬৩৪	৬৩৪
পরিবারের সদস্য	৮১	৯০	১৭১	৮৬	১৪৩	২২৯	১৬৭	২৩৩	৪০০
নন সদস্য/সদস্য বহির্ভূত	৯	৩৬	৪৫	২৪	৩১	৫৫	৩৩	৬৭	১০০
মোট	৯০	২২৯	৩১৯	১১০	৭০৫	৮১৫	২০০	৯৩৪	১১৩৪

রোগের বর্ণনা

এ সময় যে সকল রোগের চিকিৎসা দেওয়া হয় তার মধ্যে কিছু সাধারণ রোগ আর কিছু ভাইরাস উপসর্গ জাতীয় রোগ। সাধারণ রোগের মধ্যে সবচাইতে বেশী রোগী আসে ব্যথা সংক্রান্ত ২৫৪ জন (৩০.৩%) ও গাইনী বিষয়ক ২৪৯ জন (২৯.৭%)। ভাইরাস উপসর্গের রোগীর মধ্যে সবচাইতে বেশি আসে জ্বর নিয়ে ৯৭ জন (৩২.৭%) আর তারপরে আসে কাশি/সর্দি নিয়ে ৭৩ জন (২৪.২%)। দেখুন তালিকা ২।

তালিকা ২. রোগ অনুযায়ী রোগীর সংখ্যা

সাধারণ রোগের নাম	সংখ্যা			ভাইরাস উপসর্গ সম্পন্ন রোগের নাম	সংখ্যা		
	পুরুষ	মহিলা	মোট		পুরুষ	মহিলা	মোট
ব্যথা সংক্রান্ত	৬৩	১৯১	২৫৪	জ্বর	২৩	৭৪	৯৭
গাইনী সংক্রান্ত	-	২৪৯	২৪৯	কাশি/সর্দি	২২	৭২	৯৪
হরমোনাল	৩১	৭৬	১০৭	গলা ব্যথা	১০	২৭	৩৭
চোখ	৩৮	১৭	৫৫	দূর্বলতা	১৯	৩০	৪৯
চর্মরোগ	১২	৬২	৭৪	পাতলা পায়খানা	৭	১৩	২০
অন্যান্য	২৩	৭৫	৯৮	-	-	-	-
মোট	১৬৭	৬৭০	৮৩৭	মোট	৮১	২১৬	২৯৭

টেলিফোন ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান

গত ১লা জানুয়ারি ২০২০ থেকে ৩০শে জুন ২০২০ পর্যন্ত সর্বমোট ৭৯,৮২৫ জন রোগীকে আইডিএফ পরিচালিত বিভিন্ন স্থানে স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও টেলিফোনে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয়। উল্লেখিত দুইটি শাখার অধীনে যে সকল কেন্দ্রসমূহ রয়েছে ঐ সকল কেন্দ্রসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে যে কেন্দ্র রয়েছে সেটাকে স্যাটেলাইট ক্লিনিক করা হয়েছে। বহদ্দারহাট ও মোহরা শাখার অধীন যে সকল স্পট এ স্যাটেলাইট ক্লিনিক করা হয়েছে তার নাম তালিকা ৩ এ প্রদান করা হল। শুক্রবার ছাড়া সপ্তাহের বাকি ছয়দিন প্রতিদিন সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত ক্লিনিকসমূহের কাজকর্ম চালু রাখা হয়।

তালিকা ৩. স্যাটেলাইট ক্লিনিক অনুষ্ঠানের স্থানসমূহ

বার	স্যাটেলাইট/স্পট এর স্থান	
	বহদ্দারহাট	মোহরা
শনিবার	খতিবের হাট (খতিব পাড়া)	খেজুর তল
রবিবার	কালামিয়া বাজার	হামিদচর/বড়ুয়া পাড়া
সোমবার	চকবাজার (দেবপাহাড়), সাধুর পাড়া	ওয়াশা বালুরটাল
মঙ্গলবার	গোয়াল পাড়া	চররাঙ্গাঁ মাটিয়া
বুধবার	বলির হাট	জেলে পাড়া
বৃহস্পতিবার	২ নং গেইট	ইস্পাহানি জেটি রোড

উক্ত স্যাটেলাইট ক্লিনিকগুলো সপ্তাহভিত্তিক পরিচালনার মাধ্যমে সেবা দেয়া হয়। স্যাটেলাইট ক্লিনিক চলাকালীন করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য সচেতনতা মানা হয়। যেমন- দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক, স্যানিটাইজার ব্যবহার করা ইত্যাদি। প্রতিদিন ১০-১৫ জন রোগী

চিকিৎসাসেবা বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত চিকিৎসা সেবা নিয়ে থাকেন। সাধারণত স্যাটেলাইট ক্লিনিক চলাকালীন বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয় না। গত ফেব্রুয়ারি ২০২০ ইং মাসে আইডিএফ বহদ্দারহাট শাখার আওতাধীন খতিবের হাট এ (মাজার প্রাঙ্গণে) এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা একটি গাইনী ও শিশু পুষ্টি বিষয়ক স্বাস্থ্য ক্যাম্প করা হয় এবং বিনামূল্যে ১৩৭ জনকে ঔষধ বিতরণ করা হয়।

অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বাংলাদেশে শুরু হওয়ার পর থেকে মাঠপর্যায়ে চিকিৎসা সেবা দিতে গিয়ে বিভিন্ন প্রকার বাধার সম্মুখীন হই যেমন- এলাকায় ঢুকতে না দেয়া, বসতে না দেয়া ইত্যাদি। যা পরবর্তীতে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও আইডিএফ এর সদস্যা ও তাদের অভিভাবকদের সাথে কথা বলে আমাদের স্যাটেলাইট ক্লিনিকের উদ্দেশ্যগুলো বুঝিয়ে রাজি করানো হয়। করোনা পরিস্থিতিতে চিকিৎসক হিসেবে কাজ করা খুবই কষ্টকর এবং চ্যালেঞ্জিং। নিজেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিরাপদ রেখে সেবা চালু রাখতে হয়। সেই সঙ্গে রোগীকেও সাবধানে রাখতে হয়।

সংক্রমণকালীন বর্তমান এই সময়ে সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে পারে শুধুমাত্র টেলিমেডিসিন সেবা। আমাদের চার পাশের মানুষকে ভালো রাখার এক অনন্য উপায় টেলিমেডিসিন সেবা। টেলিফোনে সংযোগ থাকাকালীন রোগীর অবস্থা জেনে স্বাস্থ্য বিধি তথ্য দেয়ার পর সংক্রমণের অধিক ঝুঁকিপূর্ণ মনে হলে করোনা (COVID-19) পরীক্ষা কেন্দ্র বা হাসপাতালে যাওয়ার জন্য পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

দূর্যোগের এই মূহুর্তে অন্য রোগের রোগীরাও তাদের চিকিৎসার প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসা কেন্দ্রে যেতে না পারার কারণে চিকিৎসা সেবা পেতে আইডিএফ প্যারামেডিক/স্বাস্থ্য কর্মকর্তার মাধ্যমে পরিচালিত মাঠ পর্যায়ে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে চিকিৎসা ও পরামর্শ নিচ্ছেন। টেলিমেডিসিন সেবার মাধ্যমে প্রায় ৭০-৮০% প্রাথমিক চিকিৎসা সহায়তা নিয়ে সুস্থ হওয়া সম্ভব। এছাড়াও সংক্রমণ শুরু কালীন সময়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও বিভিন্ন জায়গায় সচেতনতা মূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

১৯৯৩ সালে আইডিএফ বান্দরবান উপজেলার সুয়ালক শাখার মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র মানুষকে ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে কার্যক্রম শুরু করে এ পর্যন্ত কার্যক্রমের আওতার বিশাল বিস্তৃতি ঘটিয়েছে। কৃষি থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে মৎস্য, প্রাণীজ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি, প্রবীণ সমস্যাসহ মানুষের জীবিকায়নের সকল ধরণের কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে আইডিএফ। ২০২০ সালে করোনার কারণে সকল কর্মকান্ড পরিচালনায় অসুবিধার সৃষ্টি হলেও আইডিএফ নানা বাধা বিপত্তির মধ্যেও সকল কর্মকান্ড কমবেশি চালিয়ে যাচ্ছে। এ সকল অভিজ্ঞতার কথা আমরা পরিক্রমায় তুলে ধরতে চেয়েছি। কিন্তু স্থানাভাবে সকল কার্যক্রমের কথা এ সংখ্যায় লেখা সম্ভব হল না। বিশেষ করে কৃষি, মৎস্য, প্রাণী সম্পদ, সমৃদ্ধি কর্মসূচি, প্রবীণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ক কর্মকান্ডের অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য সংবাদ আগামি সংখ্যায় তুলে ধরার আশা করছি।

হালদা নদী সংবাদ

হালদা নদী এ উপমহাদেশে একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র। এক সময় বড় বড় রুই, কাতলা মাছের প্রচুর ডিম পাওয়া যেত এই নদীতে। নানা কারণে এই ডিমের পরিমাণ এখন অনেক কমে যাচ্ছে। কারণগুলির মধ্যে মনুষ্যসৃষ্ট নানাবিধ উপদ্রবই প্রধান। এ গুলিকে সুরাহা করে পুরোনো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার জন্য আইডিএফ পিকেএসএফ এর সহায়তায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এরই ফলশ্রুতিতে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলে এবার করোনাকালে হালদা নদীতে সাম্প্রতিককালের সর্বাপেক্ষা ডিম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিবরণ লিখে পাঠিয়েছেন আইডিএফ এর মো: শামীম উদ দোহা।

করোনায় শুভ বার্তা দিল হালদা

এক যুগে সবচেয়ে বেশি ডিম সংগ্রহের রেকর্ড

ভূমিকা ঃ হালদা নদী দেশের তথা উপমহাদেশের স্বাদু পানির কার্প জাতীয় মাছের একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র। প্রতিবছর হালদা নদীতে একটি বিশেষ মুহূর্তে ও বিশেষ পরিবেশে রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ ও কার্প জাতীয় মাতৃমাছ প্রচুর পরিমাণ ডিম ছাড়ে। সাধারণত এসব মাছ মধ্য এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে হালদায় ডিম ছাড়লেও মে মাসেই বেশিরভাগ ডিম সংগ্রহ করা হয়। ডিম ছাড়ার বিশেষ সময়কে 'তিথি' বলা হয়ে থাকে যাকে স্থানীয়রা 'জো' বলে। মা মাছেরা এসময়ে শুধু অমাবস্যা বা পূর্ণিমার তিথিতে অনুকূল পরিবেশে ডিম ছাড়ে। এই জো বা তিথি এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা হতে হবে, সেই সাথে প্রচন্ড বজ্রপাতসহ বৃষ্টিপাত হতে হবে। এই বৃষ্টিপাত শুধু স্থানীয়ভাবে হলে হবে না, তা নদীর উজানেও হতে হবে। ফলে নদীতে পাহাড়ী ঢলের সৃষ্টি হয়। এতে পানি অত্যন্ত ঘোলা ও খরস্রোতা হয়ে ফেনাকারে প্রবাহিত হয়। জো এর সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হল নদীর জোয়ার-ভাটার জন্য অপেক্ষা করা। পূর্ণ জোয়ারের শেষে অথবা পূর্ণ ভাটার শেষে পানি যখন স্থির হয় তখনই কেবল মা মাছ ডিম ছাড়ে। মা মাছেরা ডিম ছাড়ার আগে পরীক্ষামূলকভাবে অল্প ডিম ছাড়ে। ডিম ছাড়ার অনুকূল পরিবেশ না পেলে মা মাছ ডিম নিজের দেহের মধ্যে নষ্ট করে দেয়।

ডিম পাড়ার অতীত রেকর্ড ঃ একসময় এ নদীতে রুই জাতীয় মাছেরা মৌসুমে প্রচুর পরিমাণে ডিম পাড়তো। এক হিসাবে দেখা যায়, ১৯৪৫ সালে ১,৩৬,০০০ কেজি এবং ১৯৫০ সালে ৯০,০০০ কেজি ডিম সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু ইদানীং কালের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ডিম পাড়ার পরিমাণ অনেক কমে গেছে। যেমন ২০০৭ সালে এ নদী থেকে ২২,৩১৪ কেজি, ২০০৮ সালে ২,৪০০ কেজি, ২০০৯ সালে ১৩,২০০ কেজি, ২০১০ সালে ৯,০০০ কেজি, ২০১১ সালে ১২,৬০০ কেজি, ২০১২ সালে ২১,২৪০ কেজি, ২০১৩ সালে ৪,২০০ কেজি, ২০১৪ সালে ১৬,৫০০ কেজি, ২০১৫ সালে ২,৮০০ কেজি, ২০১৬ সালে ৭৩৫ কেজি (নমুনা ডিম) সংগ্রহ করা হয়।

ডিম কমে যাওয়ার কারণসমূহ ঃ নানা কারণে হালদার বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হচ্ছে, যার বিরূপ প্রভাব পড়ছে মাছের প্রজননে। মনুষ্য সৃষ্ট নানা প্রতিবন্ধকতা যেমন-নির্বিচারে মা মাছ শিকার, বালি উত্তোলন, নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপন, শাখা নদীতে স্লুইস গেইট নিমার্ণ, হালদা নদীর উৎসমুখের দুই পাড়ের তামাক চাষের দূষণ, অজস্র শিল্পকারখানার বর্জ্য নিঃসরণ-এ সকল কারণে মা মাছের নির্বিঘ্ন ডিম পাড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। ট্যানারির দূষিত বর্জ্যও সরাসরি নদীতে গিয়ে পড়ছে। নদীর মাটি ও পানি ব্যবহার করে চলেছে বিভিন্ন ইটভাটা। চট্টগ্রামের কিছু এলাকার বর্জ্যও খাল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এই নদীকে নিরন্তর দূষিত করে চলেছে। এছাড়া এ নদীতে রয়েছে বিপন্ন প্রজাতির ডলফিনসহ বহু জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের বসবাস। এসব কারণে হালদা নদীর উৎপাদনশীলতা দিন দিন কমতে থাকে।

আইডিএফ এর প্রকল্প ঃ এ অবস্থা থেকে হালদাকে উদ্ধারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মূখ্য সচিব জনাব আবদুল করিম (পিকেএসএফ এর তখনকার এমডি) পিকেএসএফ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান-ইফাদের সহায়তাপুষ্ট PACE প্রকল্পের অর্থায়নে বিগত ১০ই এপ্রিল, ২০১৬ তারিখ হতে পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা 'ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)' এর মাধ্যমে " হালদা নদীতে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প হাতে নেয়। এ প্রকল্পে হালদার মা মাছ রক্ষা ও হালদাকে দূষণমুক্ত করার জন্য এলাকার জনগণ, সাংসদ, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, মৎস্য বিভাগ, প্রশাসন, সাংবাদিক, স্থানীয় ডিম সংগ্রহকারী, মৎস্যজীবি, কৃষক সবাইকে সম্পৃক্ত করে। এছাড়াও হালদা নদীর উপর গবেষণা করার জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আগামী বছর হালদা রেণু পোনার ব্র্যান্ডিং

করার পরিকল্পনা আছে যাতে রেণু পোনা ক্রয়কারীগণ না ঠকে এবং হালদার আসল রেণু পোনা ন্যায্য দামে পায়।

প্রকল্প বাস্তবায়নঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে জেলা মৎস্য বিভাগ, প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে হালদার মা মাছ সংরক্ষণ, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এরই অংশ হিসাবে প্রকল্প থেকে হালদার দুই পাড়ে (এক পাড়ে ২০ জন করে) ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ, ১ টি স্পীড বোট, ১ টি ইঞ্জিন নৌকা ও ১ টি সোলার বোট সর্বক্ষণ প্রস্তুত রেখেছে। প্রাকৃতিকভাবে রেণু উৎপাদনের জন্য ১৫৭ টি মাটির কুয়া সৃজন করা হয়েছে।

এর বাইরে প্রশিক্ষণ, সেমিনার, তামাক চাষীদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান, মাইকিং, লিফলেট বিতরণ, বিষমুক্ত চাষের উপকরণ ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। তাই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার পর থেকেই এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে। বিগত ২০১৭ সালে হালদা নদীতে ১,৬৮০ কেজি, ২০১৮ সালে ২২,৬৮০ কেজি এবং ২০১৯ সালে ৭,০০০ কেজি ডিম পাওয়া গেছে (ভাটার সময় ডিম পাড়ায় ডিম ভেসে যাওয়ায় সবটা গণনা সম্ভব হয় নি।)। আর এবারে অর্থাৎ ২০২০ সালে গত ১৪ বছরের রেকর্ড ভঙ্গ করে ২৫,৫৩৬ কেজি ডিম পাওয়া যায় এখানে।

এ বছরের সফলতা ঃ গত ২২ মে ২০২০ তারিখ হালদা নদীতে ভোর রাত থেকে মা মাছ ডিম ছাড়া শুরু করে। ২৮০ টি নৌকায় ৬১৬ জন ডিম সংগ্রহকারী রাত ১২.৩০ থেকেই নদীতে অবস্থান করছিল। সকাল ৭.৩০ থেকে তারা ডিম সংগ্রহ শুরু করে এবং বিকেল ৩ টার মধ্যে প্রায় ২৫,৫৩৬ কেজি ডিম সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। হালদার কাগতিয়ার আজিমের ঘাট, খলিফার ঘোনা, বিনাজুরী, সোনাইর মুখ, আবুর খীল, সত্তারহাট, দক্ষিণ গহিরা, পশ্চিম গহিরা, অংকুরী ঘোনা, মোবারকখীল, মগদাই, মদুনাঘাট, উরকিচর এবং হাটহাজারী গড়দুয়ারা, নাপিতের ঘাট, সিপাহীর ঘাট, আমতুয়া ও মার্দাশা এলাকায় বেশি ডিম পাওয়া গেছে। ডিম ও রেণু নির্ধারণ কমিটি (জেলা মৎস্য অফিসার, সমন্বয়ক হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাব, পিকেএসএফ-আইডিএফ প্রতিনিধি, বিএফআরআই প্রতিনিধি) তা নিশ্চিত করেছে। এবারের ডিম সংগ্রহ বিগত ১৪ বছরের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে।

সফলতার কারণঃ এবারকার সফলতার পেছনে সরকারি-বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানের অবদান থাকলেও পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থা আইডিএফ এর কর্মকান্ডের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এবছর দেশজুড়ে করোনা দুর্যোগের সময়ও আইডিএফ এর স্বেচ্ছাসেবক দল মা-মাছের ডিম সংগ্রহের কর্মযজ্ঞ প্রত্যক্ষ এবং নিয়ন্ত্রণ করেছে। অবৈধ মৎস্য শিকারীদের জাল পোড়ানো থেকে শুরু করে বিভিন্ন কর্মকান্ড অব্যাহত রেখেছে। আইডিএফ-পিকেএসএফ বাস্তবায়িত "হালদা নদীতে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প এর আওতায় সারা বছর আইডিএফ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে এসেছে। বিশেষ করে সামাজিকভাবে হালদাকে রক্ষা করার জন্য আইডিএফ এর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সকলের প্রশংসা যুগিয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় আইডিএফ এর গৃহীত পদক্ষেপ এর মধ্যে প্রাকৃতিক প্রজনন নিবিড় করার লক্ষ্যে হালদা নদীতে পাহারার ব্যবস্থা করা; স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় নদীতে অবৈধ জাল/ইঞ্জিন চালিত নৌকা/ড্রেজার ব্যবহার রোধে টহল পরিচালনা; সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে নদী পাড়ের কলকারখানাগুলোতে পরিবেশবান্ধব কর্মকান্ড ফিরিয়ে আনা; নদী পাড়ের স্কুল -মাদ্রাসায় সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ক্যাম্পেইন; উজানে তামাক চাষ বন্ধ করে নদী পাড়ের মানুষদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা; মসজিদের ইমামদের মাধ্যমে নদীর মা মাছ শিকার বন্ধে কর্মকান্ড পরিচালনা; পলিসি ডায়লগ/অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে ক্ষতিকর উন্নয়ন প্রকল্পে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন; বিভিন্ন অংশীজন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, পরিবেশবাদী সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় প্রশাসনসহ সরকারের বিভিন্ন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নদীকেন্দ্রিক সচেতনতা বৃদ্ধি; বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কারিগরী পরামর্শক কমিটি গঠন; আইডিএফ-পিকেএসএফ এর আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হালদা নদী গবেষণা কেন্দ্র (যা বাংলাদেশের একমাত্র একক নদী গবেষণা কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠা করা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, করোনাকালীন সময়ে মনুষ্যসৃষ্ট উপদ্রবও কম হয়েছে। মানুষ সচেতন থাকলে এ ধারা অব্যাহত থাকবে। ইতিমধ্যে হালদা নদী ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে স্বীকৃতি পাবার জন্য আবেদন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে স্বীকৃতি পেলে তা হবে দেশের জন্য পরম গৌরবের বিষয়।

শেষ কথাঃ এবার সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সবার আন্তরিক পরিশ্রমের ফলে রেকর্ড পরিমাণ ডিম পাওয়া গেছে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে আশা করি ভবিষ্যতে আরো বেশি সফলতা আসবে।

এক নজরে আইডিএফ এর কতিপয় কর্মসূচির অগ্রগতি জানুয়ারি - জুন, ২০২০

১. ঋণ কর্মসূচি

ক. ঋণ বিতরণ

ঋণের ধরণ	বিতরণ	
	টাকা (কোটি)	%
বুনিয়াদ	১.৪৯	১.১৯
জাগরণ	৪৯.২৩	৩৯.৪০
অগ্রসর	৫৬.৫৫	৪৫.২৬
সুফলন	১৫.৫৬	১২.৪৫
অন্যান্য	২.১২	১.৭০
মোট	১২৪.৯৫	১০০

খ. সদস্য সংখ্যা

বিবরণ	সংখ্যা
সদস্য সংখ্যা ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত	১,২২,৬৫৮
ভর্তি	৮,৮০৮
বাতিল	১০,০১৫
মোট জুন ২০২০ পর্যন্ত	১,২১,৪৫১

২. সোলার কর্মসূচি

বিবরণ	সংখ্যা	%
সোলার হোম সিস্টেম	৩,৬৪৬	৬৯.৭
স্ট্রীট লাইট	১,৪৫৭	২৭.৮
মিনিগ্রীড	১২৯	২.৫
মোট	৫,২৩২	১০০

৩. সদস্য সুরক্ষা কর্মসূচি

সুরক্ষাসমূহ	সুবিধাপ্রাপ্ত/সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	%
মৃত্যজনিত (সদস্য/অভিভাবক)	১৩৪	৪৬,৩২,২১৬	৬১.৩৬
চিকিৎসাসেবা	৫,১৫০	২৪,৯২,২১৩	৩৩.০১
প্রকল্পঝুঁকি	১৫	৪,২৫,১৩৭.০৯	৫.৬৩
মোট	৫,২৯৯	৭৫৪৯৫৬৬.০৯	১০০

৪. স্বাস্থ্য কর্মসূচি

বিবরণ	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)
স্ট্যাটিক ক্লিনিক	৪২৯	১৪৩২ জন
স্যাটেলাইট ক্লিনিক	৫৮৩২	৭৯৮২৫ জন
কাউন্সেলিং সেশন	৫৬২৬	৭৬৪৫৭ জন
বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ	১৮০৫ জন	৪,৩২,৫১৭/- টাকা
টেলিমেডিসিন		১৪৫১৪ জন
তিনটি হেলথ সেন্টারে অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য ক্যাম্প		
গাইনী + মেডিসিন ক্যাম্প	৭	১০৯০ জন
চক্ষু ক্যাম্প	১	৪৩৫ জন